মানুষংহিতা প্রভৃতি আর্য গ্রন্থে প্রজাকর্তৃক রাজাকে দেয় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্দিষ্ট করার যে হিসাব (১/৬, ১/৮ বা ১/১০ ইত্যাদি) প্রদত্ত, তা কোত্থেকে পেল আর্যরা? আর্যরা তো কৃষি সমাজের জনগোষ্টি ছিল না, ছিল গো-পালন সমাজের অধিভুক্ত। আর্য আগমনের অনেক কাল আগে সিন্ধু সভ্যতাই কৃষিসংক্রান্ত এসব হিসাব- নিকাশের প্রবর্তন ঘটায় মানুষের প্রয়োজনে। এখানে এটাও প্রাসঙ্গিক হয়ে আসবে যে 'চক্র' বা 'চাকা' ও আর্যদের অবদান নয়, এটাও সিন্ধুবাসীদের অবদান। আর এই চাকা বা পরিমন্ডল বা বৃত্ত হলো একেকটি সামগ্রিক সূচক। ফলে এই 'চক্রে'র বা বৃত্তের যিনি প্রধান বা 'হেডম্যান' (ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী হেনরী সমনার মেইনের মতে), তিনি হলেন চক্রবর্তী, যাঁকে প্রজাদের উৎপন্ন ফসল থেকে কর (পরে রাজস্ব) দেওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক।

এখন যদি আমার মতো কোন স্বল্পজ্ঞানী প্রশ্ন তোলে যে চক্রবর্তী তাহলে ব্রাহ্মণ হয় কী করে! হতেই হবে , না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ আর্য আগমেন বহু আগে থেকেই ভারতীয় সমাজে হর্তাকর্তা ছিলেন চক্রবর্তীরা। আর সমাজে 'মন্ডল' বা পরিমন্ডল (এখানেও 'ড' আছে, যা থেকে 'ড়' হয়েছে। মন্ডল থেকে মোড়ল-গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল) বহুকাল আগে থেকেই ছিল। আর্যরা গো-পালন সমাজ থেকে কৃষিসমাজে এসে হার মানল মাটির ব্যাকারণের কাছে। ফলে তারা আগে থেকেই যারা নিয়ন্ত্রক ছিল সমাজের, যারা ছিল 'কর'-এর মালিক, তাদের (সেই সব মন্ডলপ্রধান বা চক্রবর্তীদের) নিজেদের সঙ্গে বসিয়ে নিল চালকের আসনে। তা না হলে তাদের পক্ষে তাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব ছিল। একই কারণে নিজেদের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের সমকক্ষতায় তারা বসাতে বাধ্য ছিল শিবকেও। কেননা শিবকে অস্বীকার করলে পুরো কৃষিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক দেবতাকে অসম্মান করা হয় এবং তার পরিণাম হলো ফসলশূন্যতা। অতুল সুর এবং আরো অনেক নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, শিবের গাত্রবর্ণই প্রমাণ করে যে শিব আদি ভারতীয় দেবতা। শুধু তা-ই নয়, আর্য গ্রন্থেই শিবসংক্রান্ত মন্ত্রাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলোর সঙ্গে জড়িত। শিবের বাহন 'ষাঁড়' বা 'ষন্ড'। এখানেও দেখা যাবে, দেবতা শিবের বাহনের মধ্যে সংলগ্ন রয়েছে শিবের মতোই প্রাচীন 'ড' বর্ণ। কাজেই ভাষা এবং সংস্কৃতি উভয় বিচারেই এটির মীমাংসা সম্ভব। এটি তো অনস্বীকার্য যে ভাষা সংস্কৃতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

একজন পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা এবং তন্মধ্যে থাকা উপাদান শব্দাবলির একটি তুলনামূলক বিচার করেছিলেন। তাঁর সেই বিচারে দেখা যায়, পৃথিবীর বহু ভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যেগুলোতে কোনো কোনো শব্দের পারস্পরিক মিল আশ্চর্য রকমের। এখন প্রশ্ন– এটি কি দৈব–পরিণাম, নাকি এর মধ্যে আছে কোনো সূত্র বা নিয়ম এবং যা দুর্জ্ঞেয় নয় বরং ব্যাখ্যাযোগ্য? আমরা আপাতত তিনটি শব্দ দৃষ্টান্ত লাতিন ভাষায় মাতের, সংস্কৃতে মাতঃ, জার্মান ভাষায় মুটের এবং ইংরেজিতে মাদার। ভ্রাতা লাতিন ভাষায় ভ্রাতের, সংস্কৃতে ভ্রাতঃ এবং ইংরেজিতে ব্রাদার। এ রকম আরো শব্দের উদাহরণ দেওয়া যায়। এই যে পারস্পরিক মিল এটি থেকে বুঝতে হবে, এই মিলের মধ্যে পরস্পরের আদি নিকট-অবস্থান এবং আদান-প্রদানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিদ্যমান। ভাষা একে অন্যের কাছে এসেছে আবার একে অন্যের কাছ থেকে দূরেও সরে গেছে। কিন্তু নৈকট্যের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে গেছে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের ইতিহাস। রাজনীতির নিয়ম দিয়ে একটি জনগোষ্ঠী থেকে আরেকটি জনগোষ্ঠীকে আলাদা করা যায়; কিন্তু ভাষার গড়নকে রাজনীতির নিয়ম দিয়ে ধরা যায় না। যদি যেত, তাহলে জার্মান, ইতালীয়, ফ্রেঞ্চ, সুইস প্রভৃতি ভাষা নিজ নিজ অঞ্চলের সর্বত্র একই চেহারায় বজায় থাকত, কিন্তু তা থাকেনি। জার্মানির রাজধানী আর সীমান্ত অঞ্চলের ভাষা এক নয়, ফ্রান্সের রাজধানী এবং সীমান্ত অঞ্চলের ভাষা এক নয়। অন্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা। পৃথিবীর সব দেশের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

এই ভিন্নতার মধ্যে রয়েছে সমন্বয়ের, পারস্পরিকতার সংস্কৃতি। এমনকি নৃবিজ্ঞানীরা বলেছেন, দ্বীপরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, যেকোনো স্থলভাগের সীমান্ত ব্যতিরেকেও দ্বীপের ভাষাও 'অপর'-প্রভাবিত হতে পারে। জাপানে একটি জাতিসত্তা রয়েছে– আইনু। আইনু জনগোষ্ঠী জাপানে সংখ্যালঘু এবং তারা সংগ্রাম করে আসছে, তাদেরও সমমর্যাদাসম্পন্ন জাপানি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। আইনু জনগোষ্ঠীর ভাষায় এমন অনেক শব্দ রয়েছে, যেসব শব্দ জাপানি শিকড়জাত নয়। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এর মধ্যে রয়েছে জন-অভিপ্রয়াণের ইতিহাস। ভাষা কখনোই স্বয়ম্ভূ কোনো বৃত্ত থেকে উৎপন্ন হয়নি।